সভ্যতা। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তার বিশাল সাম্রাজ্য তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়ে- (১) অন্টিগোনিদের অন্তর্গত মেসিডোনিয়া ও গ্রীস, (২) সেল্যুকদের শাসিত এশীয় অঞ্চল এবং (৩) টলেমীদের দ্বারা শাসিত মিশর। টলেমীদের কালে মিশর ছিল গ্রীক বিজ্ঞানের প্রধান কেন্দ্রস্থল। তবে এটিই একমাত্র কেন্দ্র ছিল না, যেখানেই গ্রীক উপনিবেশ, তা এশিয়াতেই হোক অথবা অন্যত্র, সেখানে এ ধরনের বিজ্ঞান চর্চার পরিবেশ গড়ে উঠেছে। তৃতীয় শতাব্দিতে এ ধরনের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো সিসিলির সিরাকিউজ নগর, যেখানে আর্কিমিডিসের মতো প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল। আর্কিমিডিস কীভাবে সিসিলি দ্বীপে উপস্থিত হয়েছিলেন সে সময়কার ওই অঞ্চলের গ্রীক-ফিনিসীয়-রোমানদের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষের ইতিহাসের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রয়েছে, তা উদঘাটনের অবকাশ আমাদের নেই।

আর্কিমিডিসের প্রতিভা বহুতল বিস্তৃত- গণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি নানা শৃঙ্খলা তার অবদানে সমুজ্জল। ইউক্লিড যদি সর্বকালের জন্য জ্যামিতি শাস্ত্রের মান নির্দিষ্ট করে গিয়ে থাকেন, আর্কিমিডিস ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন বলবিদ্যার ও পূর্তবিদ্যার। জ্ঞানচর্চার দার্শনিক পদ্ধতিতে তিনি ছিলেন ইউক্লিডের অনুসারী অর্থাৎ যুগপৎভাবে বহু বিদ্যার অনুশীলনের পরিবর্তে স্বল্পসংখ্যক শৃঙ্খলার উপর ঘনীভূত একাগ্রচিত্ত অনুশীলনে মনোনিবেশ ও বিশিষ্টতা অর্জন, যা কি না আলেক্সান্দ্রীয় জ্ঞান সাধনার বিশেষত্ব। ত্রিকোণমিতিতে তার প্রদত্ত পাই'র (π) সন্নিকৃষ্ট মান (২২/৭) আমরা আজও ব্যবহার করে থাকি। কালের করাল থাবা থেকে বেঁচে যাওয়া তার কতিপয় গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো ঃ

সমতলের সুস্থিতি : দুই খণ্ড (On the Equilibrium of Planes, I and II)
অধিবৃত্তের পাদসংস্থান (Qudrature of the Parabola)
গোলক ও বেলন (On the Sphere and Cylinder)
সর্পিল (On Spirals)
শঙ্কুসদৃশ ও গোলকসদৃশ ঘন (On Conoids and Spheroids)
ভাসমান বস্তু : দুই খণ্ড (On Floating Bodies, I and II)
বৃত্তের পরিমাপন (Measurement of a Circle)
বালুকারাজির হিসাব (The Sand Reckoner)
স্টমাকিয়ন (Stomchion)
জ্যামিতিক ধাঁধা (Geometric Puzzle)
লেমা সংক্রান্ত পুস্তক (Books of Lemmas)
গরু সমস্যা (Cattle Problem)

তবে অনেকের মতে তার লিখিত 'Method of treating of Mechanical Problems, dedicated to Eratostbenes' বা সংক্ষেপে Epbodos (method) অর্থাৎ 'পদ্ধতি' গ্রন্থটি আর্কিমিডিস প্রতিভার উজ্জ্বলতম প্রকাশ। এ প্রসঙ্গে প্রাচীন বিজ্ঞানের ইতিহাসের লেখক জর্জ সাটনের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে ঃ

"... এটি ইতিহাসের সবচেয়ে জ্ঞান উদঘাটনকারী দলিলগুলোর অন্যতম। আর এই জ্ঞান কেবল প্রাচীন বিজ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং সকল যুগের সার্বিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।" [প্রাচীন বিজ্ঞানের ইতিহাস, জর্জ সাটন, বাংলা অনুবাদ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮]

পরিশিষ্ট ২. আপেলের কাহিনী ও নিউটন

নিউটনের পুরো নাম স্যার আইজাক নিউটন (Sir Issac Newton)। আধুনিক বলবিজ্ঞানের (Mechanics) জনক মহামতি নিউটন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৬৪২ সালে ইংল্যান্ডের *উলসথ্রোপ নামক পাড়াগাঁয়ে। নিউটন কর্তৃক মাধ্যাকর্ষণ বলের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদানের পূর্বে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রবেশের আগ পর্যন্ত কোন জড় বস্তুর নিম্নমুখী পতনকে অর্থাৎ বস্তুর ওজনকে সকল বস্তুর সহজাত ধর্ম বলে গণ্য করা হতো, যার কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। বস্তুর ওজন যে আসলে পৃথিবী ও বস্তুর মধ্যে আকর্ষণের বহিঃপ্রকাশ এই বিবেচনা নিউটন ও তার সমসাময়িকদের অনেকের মধ্যে স্ফুরিত হয়েছিল। এদের মধ্যে রবার্ট হুক ছিলেন প্রসিদ্ধ। সে সময় মনে করা হতো যে পৃথিবীর পৃষ্ঠের উপর বস্তুর গতি-প্রকৃতি আকাশ মণ্ডলে পরিক্রমণরত জ্যোতিষ্কদের গতির নিয়ম থেকে আলাদা। নিউটনের ছাত্রাবস্থাকালে আকাশচারী জ্যোতিষ্কদের গতি, বিশেষ করে গ্রহ ও সূর্যের গতি সম্পর্কে আলোচনা সে সময়ের একটি চিত্তাকর্ষক বিষয়। বিষয়টি ১৬৬৪ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রাকৃত দর্শনের' (natural philosophy) ছাত্রদের মধ্যেও আলোচিত হতো। সেকালে পদার্থবিদ্যাকে বলা হতো প্রাকৃত দর্শন। ১৬৬৫ সালে মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দিলে কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে ছাত্রদের যার যার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এদের মধ্যে ছিলেন 'কলেজের বৃত্তিধারী ছাত্র' আইজাক নিউটন, তিনি তখন ২৩ বছরের যুবক। উলসথ্রোপে গ্রামের বাড়িতেও এসব প্রশ্ন নিউটনের মনকে আচ্ছন্ন রেখেছিল। গল্প আছে যে গাছ থেকে একটি আপেলের পতন তাকে উদ্দীপ্ত করেছিল। তার কাছে হঠাৎই মনে হল যে 'মহাকর্ষণ' বলে আপেলটি পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয়- সেই একই বলে পৃথিবী চাঁদকে আকর্ষণ করছে। নিউটনের কাছে পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয়েছিল যে নিজ কক্ষপথে চাঁদের 'কেন্দ্রাভিগ ত্বরণ' আর পৃথিবীর উপর কোনও বস্তুর 'নিম্নাভিমুখী ত্বরণে'র উৎস সম্ভবত একই। পৃথিবী পৃষ্ঠে জড়বস্তুর গতি এবং মহাকাশে জ্যোতিষ্কের গতি একই নিয়মের অধীন - এই চিন্তাধারা সনাতনী ঐতিহ্য থেকে স্বতন্ত্র। নিউটনের সাথে সম্পর্কিত আপেলের কাহিনীটি কতটা সত্য, নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে নিউটনের বন্ধু স্টুকেলি (Stukeley) কর্তৃক লিখিত তার জীবন কাহিনীতে লেখক বলেছেন যে একদিন তিনি নিউটনের সাথে বাগানে কয়েকটি আপেল গাছের নিচে বসে চা পান করছিলেন, সে সময় নিউটন উল্লেখ করেছিলেন যে এই একই ধরনের পরিবেশে তিনি মহাকর্ষণের প্রাথমিক ধারণাটি পেয়েছিলেন। "এটি ঘটেছিল এমনিই এক পরিবেশে, তিনি বসেছিলেন গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় - আর তখনই আপেলটি গাছ থেকে পড়েছিল .. .. .. ", লিখেছেন স্টুকেলি। এ গল্প সম্পর্কে হকিং-এর মন্তব্য হলো ঃ 'যে নিউটনের মাথায় একটি আপেল পড়ায় তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন' - এই প্রচলিত কাহিনীটি অবশ্যই সন্দেহমুক্ত নয়। নিউটন নিজে যা বলেছেন তা হলো, তিনি 'চিন্তা করার মেজাজে বসেছিলেন'. তখন' একটা আপেল পড়তে দেখে তার মাথায় মহাকর্ষ সম্পর্কে ধারণাটি এসেছিল।' (Ref: Stephen Hawking, A Brief History of Time, p7, Bantam Books, London, 1995 reprint)*

পরিশিষ্ট ৩. আলোর বিচ্ছুরণ

কোন অপটিক্যাল অর্থাৎ আলোক কৌশলের (optical device) ভেতর দিয়ে সাদা আলোক, যেমন সূর্যালোক বেরিয়ে এলে তা সাতটি রঙ'এর উপাংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই উপাংশ-সপ্ত হলো ঃ বেগুনী (violet), নীল (indigo), আকাশি (blue), সবুজ (green), হলুদ (yellow), কমলা (orange), লাল (red)- এককথায় 'বেনীআসহকলা' বা ইংরেজিতে (vibgyor)। সাতবর্ণের এই গুচ্ছকে বলা হয় বর্ণালী (spectrum)। সূর্যালোকের সাত বর্ণে বিশ্লিষ্টকরণ প্রক্রিয়ার পদার্থবিদ্যায় নাম বিচ্ছুরণ বা dispersion। সূর্যালোক থেকে বর্ণালী সৃষ্টির সহজতম আলোক ভৌত কৌশল হলো ত্রিশিরা কাচখণ্ড যাকে বলা হয় প্রিজম (prism)। নিউটনই সর্বপ্রথম এ প্রতিভাসটি অবলোকন করেছিলেন। নিউটন আলো নিয়ে আরও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, যার ফলশ্রুতিতে আলোর ব্যতিচার ধর্মও (interference) তিনি পরীক্ষণের মাধ্যমে আবিষ্কার করেছিলেন। একটি উত্তল অতসী কাচ আর সমতল দর্পণের সহায়তায় একটি সহজ পরীক্ষণের মাধ্যমে একবর্ণী হলুদ রঙের ব্যতিচার সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। এই সরল পরীক্ষণ ব্যবস্থায় পর্যায়ক্রমে হলুদ আলো ও অন্ধকারের চক্রকার বলয় সৃষ্টি হয়। অন্ধকার আর আলোর এই ডোরা চিত্রকেই বলা হয় ব্যতিচার প্রান্ত (interference fringe)। তার নামে পরিচিত 'নিউটনের অঙ্গুরী' (Newtons ring) পরীক্ষণটি গত আড়াই'শ বছর ধরে পদার্থবিদ্যার ছাত্ররা স্নাতক শ্রেণীতে আজও সম্পাদন করে আসছে। এরই নাম কি কালজয়ী!

নিউটন আলোর প্রকৃতি নিয়েও অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। প্রতিফলন, প্রতিসরণ, বিচ্ছুরণ, ব্যতিচার প্রভৃতি আলোর প্রতিভাস অবলোকন করে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে আলো বস্তুত এক ধরনের কণিকার সমষ্টি (corpuscles)। কণিকা তত্ত্বের ভিত্তিতে তিনি আলোর এতো সব বিচিত্র প্রতিভাসের পদার্থবৈদ্যিক ব্যাখ্যা দানের প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু আলোর সরল রৈখিক গতি আর আলোর প্রতিফলন ব্যতিরেকে কোনও ঘটনারই ব্যাখ্যা তিনি কণিকা তত্ত্বের ভিত্তিতে দিতে পারেননি - পরীক্ষণে দেখা যায় আলোর বেগ ঘন মাধ্যমে কমে যায়, অথচ নিউটনের কণিকা তত্ত্ব ভবিষ্যদ্বাণী করে ঠিক এর উল্টোটি। কেবল এই অনুমিতিটি সিদ্ধ বলে গ্রহণ করলেই কণিকা তত্ত্বের সহায়তায় আলোর প্রতিসরণের ব্যাখ্যা ও স্নেলের নিয়মের প্রতিষ্ঠা করা যায়। নিউটন ধারণা করেছিলেন যে, আলোক